বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দি ছায়াছবিতে 'ভারতীয়ত্ব' –এর নির্মাণ

দেবযানী সেনগুপ্ত

Abstract

Nationalism is a much-discussed topic in modern times. Promotion of nationalistic sentiments is a means of securing national property and also to establish a hegemonic control over it. The easiest means of disseminating nationalistic feelings is through culture; not the elite culture of the select few but the popular culture of the masses. It is also an effective medium of imposing the dominant nationalist narrative on the masses. In the post- independence era popular Hindi films became a means of creating and imposing a nationalistic consciousness that focused on projecting India as a 'homogeneous race' that had overthrown the colonial rule. It is not that Hindi films do not articulate the voice of protest – it is important for the ruler to ameliorate the conditions of the subaltern and eventually, at the end this voice of protest gets compromised with the power of state-promoted narratives.

Since 1947 till the present day Hindi films have played a significant role in the creation of national culture or 'Indianness'. However, the concept of nation building against the socio-economic context immediately after independence definitely underwent a change in the 90's when 'Indianness' was being defined against the backdrop of globalization. But, while tradition was extolled some ideas and a mindset typical of 'Indianness' were also promoted, that presented a counter-narrative to the western culture. Examples to elucidate this point are the concepts of femininity and womanhood and the Indian family. In the interest of capital structure that is integrated with the market economy, a peaceful, homogeneous public was needed who would be inspired and unified by the spirit of 'Indianness'. In this way a dominant state tried to promote the interest of the capitalist economy.

Therefore, a discussion on popular Hindi films would have the tendency of becoming a politically conscious discourse, for nationalism is also a construct created in the interest of capitalism. In this article popular Hindi films from the 50's to the 90's of the twentieth century, which have tried to directly or indirectly endorse or document this political objective has been analyzed, and an effort has been made to estimate how far they have been successful in this attempt and why.

Keywords: *Nationalism, Indianness, Popular Culture, Hindi films, Role of the State, Interest of capitalist economy.*

'জাতীয়তাবোধ' আধুনিক পৃথিবীর এক বহু আলোচিত ধারণা। 'ধারণা'–ই বলতে হচ্ছে–কারণ আধুনিক জাতীয়তাবোধ যে রাষ্ট্র ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেই রাষ্ট্র–সীমানা কোন প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়। ইতিহাসের বিবর্তনের নিয়মে 'রাজা'–র থেকে শক্তির ভরকেন্দ্র বিচ্যুত হয়ে আরোপিত হয়েছে রাষ্ট্রের উপর – যদিও স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের প্রতিস্পর্ধী ব্যবস্থা হিসেবেই ধরে নেওয়া হয় আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র–ভাবনাকে। তবে পাশ্চাত্য–জ্ঞান–সঞ্জাত আধুনিক জাতি–রাষ্ট্র ধারণা যে পুঁজিবাদী আর্থ–সামাজিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, তা স্বরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। কিন্তু প্রতিযোগিতা ও স্বার্থবোধ–এ ইন্ধনযোগানকারী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র–ব্যবস্থায় একটিমাত্র জোটবদ্ধ জাতিসত্তার প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে কল্পনাতেই পরিণত হতে বাধ্য। তাই আধুনিক পৃথিবীতে ঐক্যবদ্ধ জাতিকল্পনার অবাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করে Benedict Anderson বলেছেন–

> the members even the smallest nation will never know most of their fellow members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion.[১]

সুতরাং রাষ্ট্র–ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত জাতি–ভাবনা বাস্তবে কাল্পনিক, অলীক। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, এইভাবে অলীক জাতি–র (imagined community)[২] ধারণা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য কি হতে পারে? এই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার একটি ইতিবাচক তত্ত্ব আছে – যা চিন্তাবিদ রুশোর লেখায় ধরা পড়ে–

> সুষ্ঠু সমাজ–সংগঠনের উদ্দেশ্য হল মানবচরিত্রের পরম সত্তাটিকে বিসর্জন দিয়ে তাকে একটি আপেক্ষিক সত্তা প্রদান করা, তার নিজস্বতাকে একটি সাধারণ সামাজিক ঐক্যের অংশমাত্রে পরিণত করা।এর ফলে মানুষ আর নিজেকে একা হিসেবে ভাববে না, একটা বিরাট সমগ্রতার অঙ্গ হিসেবে ভাববে।[৩]

রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরাও এইভাবেই ভেবেছিলেন। ভারতীয় সমাজে বহু বিচিত্র গোষ্ঠীর পারস্পরিক আদান–প্রদান–এর সম্পর্কই যে প্রকৃত ইতিহাসের কাঠামো রচনা করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষ চন্দ্র বোসের জাতীয়তাবাদী ধারণাও ছিল অনুরূপ। বস্তুতঃ, প্রাচীন ও মধ্যযুগে – আধুনিক জাতীয়তাবাদী ধারণা উন্মেষের আগে – ভারতবর্ষের বিভিন্ন গোষ্ঠী এইরকমই একপ্রকার আদান–প্রদান ও সমান্তরাল সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইংরেজরা ভারতবর্ষ অধিকার করার পর একদিকে যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণি 'জাতীয়তাবাদ' নামক নতুন ধারণার সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং ভারতবর্ষে সেই বোধের জাগরণ ঘটাতে

চাইলেন, অন্যদিকে ইংরেজদের কূটনীতি ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতর সমান্তরাল অবস্থানকে প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে চাইল। সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮ সালের হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বৃটিশ শাসকদের এই নেতিবাচক প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেন – to separate the different communities and put them into water-tight compartments.[৪] এই প্রচেষ্টাকে ভারতীয় সমাজ প্রতিরোধ করতে পারেনি বলেই দেশভাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

দাঙ্গা ও দেশভাগের পর স্বাধীন ভারতে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ অথবা সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও তত্ত্বের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই একটি বাধা তৈরী হয়ে যায়। বহুবর্ণরঞ্জিত ও বিবাদমান ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে আধুনিক রাষ্ট্রের গঠন দিতে গিয়ে নেহেরুর অনুসন্ধান হল বহুত্ববাদের অর্ন্তনিহিত এক ও অপরিবর্তনীয় এক জাতীয় সংস্কৃতির – যা অবশ্যই পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতীয় সমাজ জীবনের সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করবে। Brigitte Schulze তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন

> Indian tradition became the central motif of politicians like Nehru. ...Nehru elaborated on how he discovered this long existing Indian cultural tradition in his The Discovery of India.[৫]

বস্তুতঃ বহুর ভিতর 'এক' ভারতবর্ষকে নেহেরু আবিষ্কার নয়, নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। জাতীয় সংস্কৃতির নির্মাণের এই প্রচেষ্টা রাজনৈতিক এবং অবশ্যই এক বিমূর্ত ও কাল্পনিক ভারতীয়ত্বের নির্মাণ। সুতরাং 'ভারতীয়ত্ব' নামক এক মিথের সৃজন ও নাগরিকদের উপর আরোপ করার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই শুরু হয়ে গেছিল।

ফুকোর মত উত্তর–আধুনিক চিন্তাবিদদের আলোচনা স্পষ্ট করে দেয় ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, জনকল্যাণমুখী যে কোন রাষ্ট্রের ধারণাই প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার আকর। ফুকোর গভর্নমেণ্টালিটির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে কি ভাবে আইন–আদালত,সামাজিক সংগঠন সমূহ, এমনকি বিবিধ জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলিও বিভিন্ন ভাবে সমাজ ও ব্যক্তি–জীবনের প্রতিটি স্তরে একধরণের নজরদারী কায়েম রাখে– যা মানুষকে অনুশাসনবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণাধীন রাখে, মানুষের সত্তা তাসের দেশ–এর মানুষদের মতই যান্ত্রিক হয়ে যায়। মজার কথা, এইভাবে যে সত্তার স্বাধীনতা বিসর্জিত হয়, মুক্ত চিন্তা বা গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হয়, তা কিন্তু সাধারণ মানুষ অনুভবই করতে পারেনা। 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমার মতই ক্ষমতার যন্তর–মন্তর ঘরে ঢুকে মগজধোলাই হয় তাদের।

মেকিভেল্লি তাঁর আলোচনায় স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন,রাজত্ব পাওয়া আর রক্ষা করা এক জিনিস নয়।ক্ষমতা ধরে রাখতে গেলে রাষ্ট্র বা শাসকের স্তরের বাইরেও জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ভিতর ক্ষমতার সম্ভাব্য ফাঁক–ফোকর অনুসন্ধান করা দরকার – যার মাধ্যমে ক্ষমতা জনসমাজের সূক্ষ্ম খাঁজে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাদের চালনা করবে,অধীন করে রাখবে। সংস্কৃতি হল জনসমাজের অন্তর্নিহিত সেই ফাঁক–ফোকর। জনসমাজের ধ্যানধারণা ও সংস্কৃতি কিভাবে ও কেন বিভিন্ন আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হচ্ছে – তা আধুনিক রাষ্ট্র–জাতি সম্পর্ক ও ক্ষমতার বিশ্লেষণে তাই একান্তই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এই আলোচনায় জনপ্রিয় সংস্কৃতি (Popular Culture)কথাটি ইদানীং বারংবার উঠে আসছে। তবে কাকে বলব সংস্কৃতি বা culture– তা নিয়েও সমস্যা আছে। সংস্কৃতিকে যদি– a particular way of life, wheather of a people, a period or a group[৬] এইভাবে ভাবি, তাহলে কিন্তু সংস্কৃতি কেন্দ্রিক আলোচনা দিশা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য, কারণ এক্ষেত্রে সংস্কৃতি একটি নির্বিশেষ ধারণায় পর্যবসিত হচ্ছে। আবার সংস্কৃতিকে যদি–a general process of intellectual spiritual and aesthetic development[৭] হিসেবে ভাবি, তাহলে সংস্কৃতি–র ধারণা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সংস্কৃতিকে তো কতরকম ভাবেই চিনে নেওয়া যায় – লোকসংস্কৃতি, সর্বহারার সংস্কৃতি, অধস্তন সংস্কৃতি, আধিপত্যকামী সংস্কৃতি, জনপ্রিয় সংস্কৃতি – এরকম আরো কত কি। যদি কেবল জনপ্রিয় সংস্কৃতি ধারণাটিকে নিয়েই আলোচনা করি, তাহলেও সমস্যা থেকে যায় এইকারণে, কাকে বলব জনপ্রিয় সংস্কৃতি? যা সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের মধ্যে প্রচারিত তাই কি জনপ্রিয় সংস্কৃতি? অথবা এলিট সংস্কৃতি বাদ দিয়ে নিম্নবর্গীয়দের আপামর সাধারণ সংস্কৃতিই কি জনপ্রিয় সংস্কৃতি? দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জনকে কিন্তু উচ্চবর্গীয়দের বিপ্রতীপে একটি স্বাধীন–সত্তা হিসেবে ধরে নিতে হয়। কিন্তু বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ক্ষমতা তো সেই স্বাধীন সত্তাকেই বিলুপ্ত করতে চায়। Stuart Hall–এর ভাষায় বলা যায়– Collective social understandings are created.[৮]

অর্থাৎ জনগণ যা ভাবছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, তা আসলে ভাবানো হচ্ছে, ভাবানো হচ্ছে পুঁজির স্বার্থে। সেই স্বার্থেই সংস্কৃতিকে জনগণের কাছে পণ্য করে তোলা হয়, সংস্কৃতি culture industry–র উপাদিত পণ্যতে পরিণত হয়। গ্রামসির 'হেগেমনি' তত্ত্ব বলছে, এইভাবেই সামাজিক সকল স্তরে ক্ষমতাসীনরা অধীনস্থদের উপর বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক স্তরে সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয়তাবাদী ধারণা আরোপের ক্ষেত্রেও তাই তদানীন্তন সরকারের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে জনপ্রিয় সংস্কৃতি।

ভারতীয় হিন্দী সিনেমা ভারতের জনগণের মধ্যে সব থেকে প্রভাব বিস্তারকারী

জনপ্রিয় সংস্কৃতি – এ কথা বলাই বাহুল্য। স্বাধীনতার পরে নয়ের দশকের আগে পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতি মূলত নেহেরু–ঘরানার সমাজতান্ত্রিক জনকল্যাণমুখী আদর্শকে অনুসরণ করেছে, তবুও সেই কাঠামোতেও যেহেতু বিযুক্ত শ্রম ও শোষণের অবসান ঘটানো যায়নি, তাই পণ্য উপাদনেরও অবসান ঘটেনি। যদিও নয়ের দশক থেকে আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী হিন্দী সিনেমার নির্মাণে পরিবর্তন এসেছে,পরিবর্তন এসেছে জাতীয়তাবাদী চেতনা আরোপণের ভঙ্গীতেও। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মূল কতকগুলি ধারণা নতুন মোড়কে ভারতীয়ত্ব হিসেবে হিন্দি সিনেমায় ফিরে ফিরে এসেছে দশকের পর দশক ধরে। বর্তমান প্রবন্ধে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পাঁচের দশক থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত হিন্দি সিনেমাতে ভারতীয়ত্ব নির্মাণের প্রচেষ্টা কি ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তনে ভারতীয়ত্ব–এর সংজ্ঞাও কি ভাবে পুনর্নির্মিত হয়েছে এবং তার সঙ্গেই আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গীয় কোনরকম প্রতিরোধ এই সিনেমাগুলিতে ভাষা পেয়েছে কিনা– সেই বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

নেহেরু ও পাঁচের দশকে 'ভারতীয়ত্ব' নির্মাণ

১৯৪৭ সালের পর এবং পাঁচের দশক ছিল জাতীয়তাবাদী ধারণা নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় নেহেরু–সরকার বিশেষ ভাবে হিন্দি সিনেমার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। Brigitte Schulze–এর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ থেকে জানা যায়

> In 1949, the Film Enquiry Committee was set up, along with the numerous institutional bodies established by Nehru's government, ...The Ministry of Information and Broadcasting defined its roll clearly within the framwork of nation building.[৯]

পাঁচের দশকে যে সিনেমাটিকে জাতীয়তাবাদী সত্তা নির্মাণের আদর্শ হিসেবে ধরা যেতে পারে, সেটি হল 'মাদার ইন্ডিয়া' ছবিটি।সিনেমাটি যেমন জনপ্রিয়, তেমনই দেশ–বিদেশে বহু আলোচিত। সিনেমাটির কেন্দ্রে একজন নারী – যিনি ভারতমাতার সঙ্গে একাত্ম। নামেই সেই ইঙ্গিত ধরা পড়ছে। সিনেমার সূচনার দৃশ্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিনেমা শুরু হচ্ছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গ্রামে বিশাল বাঁধ, তড়িৎ–স্তম্ভ ইত্যাদির ছবি দেখিয়ে – অর্থাৎ স্বাধীনতা–উত্তর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও নেহেরু–ঘরানার 'ডেভেলপমেন্ট'–এর ধারণার উদযাপন সিনেমার শুরুতেই। এরপর ফ্লাশব্যাক–এ কাহিনি বর্ণনা – অনুর্বর জমি, সেচের অভাব, জোতদারের অত্যাচার, গ্রামীণ মানুষের শহরাভিমুখিতা ও বিদ্রোহী বিরজুর বন্দুক হাতে তুলে নেওয়া। কিন্তু

মনে রাখা দরকার, এসবই ফ্ল্যাশব্যাকে অতীতের ঘটনা, অর্থাৎ পরাধীন ভারতের আর্থ–সামাজিক দুরবস্থার কাহিনি। সিনেমা শুরু হয়েছে স্বাধীনতা–উত্তর বর্তমান–এ। তখন দৃশ্যটি এরকম – উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার কারণে খালের মাধ্যমে জমির দিকে জল বয়ে যাচ্ছে। পরিকাঠামো গত উন্নতি জনজীবনকে পাল্টে দিচ্ছে ও দুঃখের দিনের অবসান ঘটাচ্ছে। কিন্তু বিশেষভাবে নজরে পড়ে খালে বয়ে যাওয়া জলের রং লাল। বহু রক্তক্ষয় ও ত্যাগ স্বীকারের ফলশ্রুতি আধুনিক ভারত নামক জাতি–রাষ্ট্রটির গড়ে ওঠা – এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এই প্রতীকের ব্যবহার এবং এইভাবেই একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ক্ষমতা স্থাপনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটিও সাধিত হয়। লক্ষ্য করবার বিষয় এই সিনেমা অথবা এই সময়ে নির্মিত অপর সিনেমাগুলিতে গ্রামই মূল প্রেক্ষাভূমি। স্বাধীনতা–উত্তর ভারতে তথাকথিত আধুনিক নীতি–নির্ধারকরা শাহরিক পাশ্চাত্য সমাজের বিপ্রতীপে এক আদর্শ। গ্রাম–সমাজের চিত্রকে ভারতীয়ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। যদিও তদানীন্তন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজির স্থান বিলুপ্ত হয়নি,তবু তার দম্ভ বা একাধিপত্য ছিল না – কিন্তু ছিল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদ। এরপর ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে নাগরিক ভোগবাদ যতবেশি আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে, হিন্দি সিনেমা থেকে ততোবেশি গ্রাম হারিয়ে যেতে থাকে।

তবে ক্ষমতার রাজনীতির অপর রূপ–ও মাদার ইন্ডিয়া সিনেমাটিতে ধরা পড়েছে। ততদিনে ভারতীয় রাজনীতিতে কম্যুনিস্ট রাজনীতির এক স্বতন্ত্র ইতিহাস রচিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিপ্রতীপে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কেরালা, ত্রিপুরা বিশেষত তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষি বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বে। স্বাধীনতা–উত্তর সময়ে ভারতের কম্যুনিস্টদের শ্লোগান ছিল 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'। সুতরাং ভারতের জাতীয়তাবাদী নীতিনির্ধারকরা কম্যুনিস্টদের উত্থানকে জাতীয়তাবাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করবে – এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। ১৯৪৮ সালে আনন্দবাজার পত্রিকাতে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়, যার নাম ছিল 'Communist conspiracy।' ১৯৪৯ ,৯ই মার্চ অমৃতবাজার পত্রিকা লেখে can there be any doubt that the communists everywhere have become potential traitors to their countries?[১০]

এইভাবেই গণমাধ্যমের মত জনপ্রিয় সংস্কৃতির বয়ানও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছিল। ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়–

> In other words, in the published discourse of this period the idea had been firmly planted that the communists were the major enemies of our freedom.[১১]

মাদার ইন্ডিয়াতে দেখি,রাধার বিদ্রোহী সন্তান বিরজু জোতদারদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের প্রতিবাদে কম্যুনিস্টদের মতই বন্দুক হাতে তুলে নিচ্ছে। যেহেতু বিরজুর এই প্রতিবাদের মধ্যে কৃষকদের নিজেদের প্রত্যাশার পরিতৃপ্তি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে, সেইহেতু বিরজুকে পরবর্তী কাহিনি–অংশে বন্দুকধারী ডাকাত–তুল্য ও নারীসম্মানভঙ্গকারী বানিয়ে ফেলা হল। প্রতিবাদী বিরজু হয়ে উঠল রাষ্ট্রের আইন–ভঙ্গকারী নেতিবাচক চরিত্র। সুতরাং আইন–ভঙ্গকারীর শাস্তি তো মৃত্যু,রাষ্ট্রের হয়ে সেই মৃত্যুদন্ড দিল বিরজুর মা রাধা। একইভাবে ভারতমাতৃকাও তার অবাধ্য সন্তানকে এই ভাবেই শাস্তি দিয়ে ন্যায় রক্ষা করেন– এই হল বক্তব্য। কাহিনির শেষে তাই ভারত–মাতা তুল্য রাধা রাষ্ট্রের দ্বারা সম্মানিত হয়, আইন–ভঙ্গকারী খুনী হিসেবে শাস্তির প্রশ্নই উঠল না।

ভারতীয়ত্ব নির্মাণের অন্যতম প্রধান দিক হল 'ভারতীয় নারী' নামক অপর মিথটিকে সৃজন করা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে – বিশেষতঃ উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের ভিতর আদর্শ ভারতীয় নারী–প্রতিমা অন্বেষণের প্রবণতা দেখা গেছিল। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ–কাঠামোয় আদর্শ নারীর পবিত্রতা জাতির মান–মর্যাদার প্রতীক। এইরকমই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই পাঁচের দশকে 'মাদার ইন্ডিয়া'র কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রটির জাতীয়তাকরণ করা হয়েছে। এই সিনেমার মূল নারী চরিত্রটি রাধা– স্বামী ত্যাগ করে যাওয়ার পর দুই সন্তানকে একাই মানুষ করে তোলে। রাধার পরিচয় মূলত সর্বংসহা স্নেহময়ী ভারতীয় মা হিসেবেই। আবার অন্যদিকে নারীর ইজ্জত–এর প্রশ্নটিও তার ভূমিকা নির্মাণে ব্যবহৃত। নারীর ইজ্জত ভঙ্গকারী খলনায়ক এবং তার উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের থিমটি এই সিনেমাতে এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক হিন্দি সিনেমায় বারংবার ফিরে ফিরে এসেছে। একগামী সতী নারীর আদর্শ হিসেবে সিঁদূর, মঙ্গলসূত্র ইত্যাদি হিন্দু ধর্মীয় চিহ্নকেও ব্যবহার করা হয়েছে মাদার ইন্ডিয়া এবং আরও অনেক হিন্দি সিনেমাতে। রাধা স্বামীর অনুপস্থিতিতে অর্থের জন্য বিক্রি হয়নি। সতীত্বের তেজ যেমন তার সংলাপে আছে, তেমনই বিবাহের ঠিক পরেই তার লজ্জাশীলা ভূমিকাটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাধার মাধ্যমে ভারতীয় নারীর আদর্শ–রূপের কাঠামোটি নির্মিত হয়ে যায় এইভাবে সে ধরিত্রী মাতার মতই সহনশীল মা,আবার প্রয়োজনে দুর্গার মতই অধর্মের বিনাশে সক্ষম,আবার অন্যদিকে প্রেমিকা হিসেবে লজ্জাশীলা, সেবাপরায়ণা বধূও বটে। তার যৌনতা আছে কি নেই সে প্রশ্নই ওঠে না, কারণ প্রেমিক বা স্বামীর যৌনচঞ্চল প্রেমের কাছে সে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিতা, কেবল সম্ভোগের বস্তু। নারীর যৌনতাকে ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে চায় বলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য জগতে নারীর যৌনমুক্তির আন্দোলনকে স্বেচ্ছাচারিতা হিসেবে আখ্যায়িত করে ভারতীয় নারী মূর্তির বিশেষ

জাতীয়তাকরণ ঘটানো হয়েছে বাণিজ্যিক হিন্দি সিনেমাতে। পাঁচ ও ছয়ের দশকের হিন্দী সিনেমার রোমান্টিক গানগুলির দৃশ্য স্মরণ করা যেতে পারে। নারী–পুরুষের সম্পর্ক তৈরীতে মেয়েরা কখনই নিজের থেকে অগ্রসর হয় না। পরন্তু পুরুষ সঙ্গীর প্রেম নিবেদনে সে হয় লজ্জা পায় অথবা নির্বিকার থাকে। প্রেম ও যৌনতার ক্ষেত্রে পুরুষের সক্রিয়তা তার ক্ষমতার প্রমাণ ও মেয়েদের নিষ্ক্রিয়তা তার শুদ্ধতার প্রমাণ হিসেবেই গৃহীত হয়েছে ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক জাতি–ভাবনায়। সেই কারণেই হিন্দি বাণিজ্যিক সিনেমায় সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীকে অনিবার্যভাবে পুরুষের কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। 'অ্যান ইভিনিং ইন প্যারিস'–এর একটি গান –'আসমান সে আয়া ফরিস্তা' – তার দৃশ্যরূপটি স্মরণ করলেই নায়িকার ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু হিন্দু নারীদের ক্ষেত্রেই নয়, আটের দশকে 'নিকাহ্' সিনেমার মুসলমান ধর্মাবলম্বী নায়িকাও প্রেমের ক্ষেত্রে লাজুক ও ভীরু। একইভাবে নয়ের দশকে মুক্তিপ্রাপ্ত 'হাম আপকে হ্যায় কৌন' সিনেমাতে দেখি প্রেমিকের অস্থির প্রেমনিবেদনের বিপরীতে নায়িকার লজ্জাবনত দৈহিকভঙ্গী।

ভারতীয়ত্ব হিসেবে আরেকটি যে বৈশিষ্ট্য 'মাদার ইন্ডিয়া'তে ব্যবহৃত হয়েছে, সেটি হল পরিবারের আদর্শ। পরিবারের আদর্শ–কাঠামো নির্মাণে ভাই–ভাইয়ের বন্ধন ও একজনের অন্যজনের জন্য ত্যাগ স্বীকার ইত্যাদি বিষয় রামায়ণ কাহিনির অনুসরণে ব্যবহার করা হয়েছে। 'মাদার ইন্ডিয়া'তে দেখি রাধার দুই ছেলে রামু ও বিরজু। বড়ছেলে রামু – নামকরণেই স্পষ্ট ইঙ্গিত রামায়ণ–নায়কের প্রতি। রামু রামের মতই পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল,ন্যায়পরায়ণ। এইভাবে পারিবারিক আদর্শের থিমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা হিন্দি সিনেমার সংখ্যা প্রচুর। 'ঘর এক মন্দির', 'দিওয়ার', অথবা নয়ের দশকের 'হাম আপকে হ্যায় কৌন', 'হাম সাথ সাথ হ্যায়' ইত্যাদি।

সাতের দশকের হিন্দী সিনেমা ও প্রতিরোধ ও আপোষ

সাতের দশক থেকে হিন্দি সিনেমায় গ্রামের পরিবর্তে কাহিনির প্রেক্ষাভূমি হয়ে উঠছে শহরের বস্তি। 'মাদার ইন্ডিয়া' সিনেমাতেই দেখেছি গ্রামের অধিবাসী শহরাভিমুখী হয়েছে, এরফলে শহরের বুকে গড়ে উঠেছে অবাঞ্ছিত বস্তি। সাতের দশকের জনপ্রিয় হিন্দী সিনেমা দুই ভাবে ব্যবহার করেছে এই বস্তিকে। একদিকে শাহরিক ভোগবাদী সংস্কৃতির নন্দনকাননের ছবি অধস্তনদের মোহগ্রস্ত করে বাস্তবকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে, 'ছদ্মবাস্তবতা' নির্মাণ করেছে,অন্যদিকে বস্তির নিম্নবর্গীয়দের হতাশা ও ক্রোধ এই সব সিনেমার কাহিনি–কাঠামো ও চড়া সুরের সংলাপে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় পাঁচের দশকে বিরজুর ক্রোধ ও প্রতিবাদ, হতাশা অথবা স্বপ্নভঙ্গজনিত আক্রোশ কাহিনির কেন্দ্রে ছিল না, কিন্তু সাতের দশকে বিরজুর মত নায়করা কাহিনি–কাঠামোর

কেন্দ্রে চলে এসেছে। কালোবাজারী, দুর্নীতি, রাজনৈতিক ভন্ডামি, বেকারত্ব ও খাদ্যাভাব এবং সর্বোপরি জরুরী অবস্থার প্রেক্ষাপটে রোমান্টিক নতনম্র নায়কের পরিবর্তে তুমুল গণ–অভ্যর্থনা পেয়েছে angry young man hero। নেহেরু জমানার জাতীয়তাবাদী চেতনা–বিস্তারের পরিবর্তে সাতের দশক থেকে সিনেমায় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের স্বর স্পষ্ট হয়ে উঠলো। পাঁচের দশকের 'মাদার ইন্ডিয়া' সিনেমাটির সঙ্গে সাতের দশকের 'দিওয়ার' সিনেমাটির তুলনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। 'দিওয়ার'–এর কাহিনিতেও নীতিপরায়ণ মা এবং তার দুই ছেলে – বড় ভাই বিজয় ছোটবেলায় ধনী ব্যবসায়ীর নির্যাতনের প্রতিশোধস্বরূপ কালোবাজারী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, ছোট ভাই রবি পুলিশ অফিসার। বিজয়ের ক্রোধ সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে, হয়তো প্রশাসন ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও। মনে রাখা দরকার ছয়ের দশকের শেষ ও সাতের দশকের শুরু পশ্চিমবঙ্গ ও আরও কিছু রাজ্য উত্তাল হয়ে উঠেছে অতি বামপন্থী প্রতিষ্ঠান–বিরোধী বিপ্লবের দ্বারা। এইরকম সময়ে হিন্দি সিনেমায় স্বাভাবিক ভাবেই নেহেরু ঘরানার হিংসা বিরোধী শান্ত–শিষ্ট জাতীয়তাবাদের মিথ আর জায়গা পায়নি। 'মাদার ইন্ডিয়া' সিনেমার ক্রুদ্ধ তরুণ বিরজু কাহিনির কেন্দ্রে ছিল না, কিন্তু 'দিওয়ার' সিনেমায় অনুরূপ চরিত্র বিজয় ও তার প্রতিবাদ কাহিনির কেন্দ্রে চলে এসেছে।

কিন্তু আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অভিপ্রায় জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমা থেকে অপসারিত হয়েছে গেছে – এমনটি ভাবা ভুল। একথাও ঠিক নয়, এই সময়ের হিন্দি সিনেমা রাষ্ট্রের অধীনতা–মুক্ত হয়ে বিরুদ্ধ প্রতিবাদী স্বরের একমাত্রিক প্রকাশ ঘটিয়ে গেছে। বস্তুতঃ, জনপ্রিয় সংস্কৃতি ততোটুকুই বলে অথবা বলেছে, যতটুকু রাষ্ট্র বলতে দিয়েছে এবং এইভাবেই জনপ্রিয় সংস্কৃতি আধিপত্যবাদীদের রাজনৈতিক অভিপ্রায়কেই সিদ্ধ করেছে। Tonny Bennet–এর উক্তি এপ্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে–

> The field of popular culture is structured by the attempt of the ruling class to win hegemony and by forms of opposition to this endeavour. As such, It consists not simply of an imposed mass culture that is coincident with dominant ideology, nor simply of spontaneously oppositional cultures, but is rather an area of negotiation between the two within which- in different particular types of popular culture - dominant, subordinate and oppositional cultural and ideological values and elements are mixed in different permutations.[১২]

এই negotiation অথবা আপোষ নিম্নবর্গীয়দের অন্তর্নিহিত উত্তাপকে নির্গত করে দিয়ে

রাষ্ট্রের আধিপত্য বজায় রাখে। 'দিওয়ার' সিনেমাটিতে তাই বিজয়ের রাগ কেন্দ্রে থাকলেও সিনেমার অপর নায়ক বিজয়ের ভাই রবি পুলিশ অফিসার আইন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিনিধি। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আইনের অনুশাসনের জয় হয় এবং রবির হাতেই বিজয় নিহত হয় এবং এই ভাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাই সিনেমার পরিণতি–শ্লোগান হয়ে ওঠে। শোলে সিনেমাতে ডাকাত গব্বর সিংকে ধরার জন্য প্রাক্তন পুলিশ অফিসার বলদেব সিং আইনের উপর আস্থা রাখেনি, দুজন জেলখাটা চোরের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। অবশ্য ভিরুর বাহুবলে গব্বর কাবু হলেও তাকে পুলিশ অফিসার বলদেব সিং–এর হাতেই প্রত্যর্পণ করতে হয় এবং ঠিক সময় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি পুলিশ এসে গব্বর সিংকে গ্রেপ্তার করে ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।ভিরু ও জয়ের ভূমিকাকে আইনের উপর আস্থাহীনতা বলে মনে হতেও পারে,আবার কারাগারের শাস্তির মেয়াদ–উত্তীর্ণ রাষ্ট্রের অনুশাসনে সংশোধিত সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী দুজন নায়ক হিসেবেও ভাবা যেতে পারে।

এই সিনেমাটি দুটিতেও পারিবারিক বন্ধন একটি প্রধান জায়গা নিয়েছে। বিধবা নারীর শুচিতা(শোলে), কষ্ট–সহিষ্ণু , আত্মবিলোপকারী এবং উচ্চ মূল্যবোধের মা (দিওয়ার) প্রভৃতি ভারতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বহুব্যবহৃত উপাদানগুলির প্রয়োগও লক্ষ্যণীয়। বিধবা নারীর প্রেম 'শোলে' সিনেমার অন্যতম প্রধান বিষয় হলেও শেষ পর্যন্ত বিধবা নায়িকার শুচি শুভ্র পোশাক ও চরিত্রে পবিত্রতা রক্ষা করা হয়, তার প্রেমিকের মৃত্যু ঘটে। 'দিওয়ার' সিনেমার মা 'মাদার ইন্ডিয়া' সিনেমার মত কাহিনির কেন্দ্রে না থাকলেও কাহিনির অন্যতম প্রধান সক্রিয় চরিত্র–যে চরিত্রটির উচ্চ নীতিবোধ ও বিপথগামী সন্তানকে ত্যাগের কাহিনি ভারতীয় নারীর মহিমা প্রকাশ করে এবং একই সঙ্গে মাদার ইন্ডিয়াকে স্মরণে এনে দেয় প্রচ্ছন্ন ভাবে। সাত ও আটের দশকের সিনেমাগুলি এইভাবেই নিম্নবর্গীয়দের ক্রোধ ও আধিপত্যবাদী শক্তির টানাপোড়েনে এক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে।

নয়ের দশক, বিশ্বায়ন, জাতীয়তাবাদ ও হিন্দি সিনেমা

আটের দশকের শেষ থেকে হিন্দি সিনেমা ও জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার এক দিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার পতন নেহেরু জমানার সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটায় এবং তারই সঙ্গে নরম হিন্দুত্ববাদ ক্রমশঃ জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। আটের দশকের শেষে দূরদর্শনের সরকারি চ্যানেলে রামায়ণ ও মহাভারতের সম্প্রচার ও প্রবল জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ ভারতীয়ত্ব নির্মাণের পরবর্তী রাজনৈতিক অভিপ্রায়টিকে স্পষ্ট করে তুলছিল।

নয়ের দশক একই সঙ্গে বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও উগ্র হিন্দুত্ববাদের সূচনা ঘটালো ও সরকারি অর্থনৈতিক নীতির আমূল সংস্কার নিয়ে এল। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও mixed economy– এর ভারত রাষ্ট্রে এল মুক্ত অর্থনীতির যুগ ও ধনতান্ত্রিক কাঠামোর একচ্ছত্র আধিপত্য। এই সময় থেকে হিন্দি সিনেমার প্রযোজনা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পুঁজি নির্ভর হয়ে ওঠে এবং সরকারি প্রযোজনা অথবা সাহায্য গৌণ হয়ে যায়। সরকার হিন্দি সিনেমা থেকে বিশাল পরিমাণ বিনোদন কর পাওয়া শুরু করে এবং এইভাবে নয়ের দশকের শুরুতে সিনেমার ব্যবসা 'industry status'[১৩] লাভ করে। সিনেমা এইসময় থেকে সম্পূর্ণভাবে পণ্যতে পরিণত হয়।

লক্ষ করার বিষয়, ভারতীয়ত্ব নির্মাণের যে সকল উপাদানগুলোর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, যেমন, আদর্শ ভারতীয় নারীর প্রতিমা নির্মাণ অথবা পারিবারিক বন্ধন ও নীতিবোধ – এই সবই অটুট রইলো এক নতুন মোড়কে। পরিবারের বন্ধন নিয়ে আবেগপ্রবণ সিনেমা পরপর মুক্তি পেল – 'হাম আপকে হ্যায় কৌন', 'হাম সাথ সাথ হ্যায়', 'কভি খুশি কভি গম' ইত্যাদি। কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় , পাঁচের দশকে সিনেমার কেন্দ্রে ছিল গ্রাম, সাতের দশকে শহরের বস্তি, নয়ের দশকে সিনেমা থেকে গ্রাম, বস্তি এমনকি মধ্যবিত্তরাও উধাও হয়ে গেল, কাহিনির কেন্দ্রে চলে এল ব্যবসায়ী পরিবার ও বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা। সিনেমার গৃহসজ্জা, নায়ক–নায়িকার পোশাক সম্পদের প্রাচুর্যকে ঘোষণা করে পণ্যের বিজ্ঞাপন হয়ে দাঁড়ালো। নায়িকার পোশাক ভারতীয় শাড়ির পরিবর্তে ক্রমশঃ পাশ্চাত্যের অনুগামী হয়ে উঠলো। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও নায়কের অস্থির প্রেম ও যৌনতার সামনে ভারতীয় নারীর লজ্জাশীলা, নিষ্ক্রিয় প্রেমিকা রূপটির অনুবর্তন হতেই থাকলো। কেবল বাইরের খোলসটির পরিবর্তন হল মাত্র।

এই সময় থেকেই হিন্দি সিনেমায় ভারতীয়ত্ব ও হিন্দুত্বকে সমীকৃত করে ফেলার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। পরিবারের বন্ধন নিয়ে সিনেমাতে সরাসরি হিন্দুদের কালচার টেক্সট রামায়ণের প্রভাব পড়লো। 'হাম সাথ সাথ হ্যায়' সিনেমাটিতে তো বিমাতার আদেশে বড়ভাই–এর গৃহত্যাগ, বৈমাত্রেয় ভায়েদের ভ্রাতৃভক্তি ও অন্তে পারিবারিক মিলন–মূল গল্প কাঠামোটি প্রত্যক্ষভাবেই রামায়ণ কাহিনির অনুকরণ। যেহেতু আটের দশকে ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি প্রবল হয়ে উঠেছিল, তাই নয়ের দশক জাতীয়তাবাদকে সুদৃঢ় করার সময়। খুব সহজেই রাষ্ট্র ও জাতির শত্রু হিসেবে পাকিস্তান চিহ্নিত হয়ে যায়। কাশ্মীর সমস্যা ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে একাধিক সিনেমা তৈরি হতে শুরু করে। 'রোজা' ছবির বিষয় বিচ্ছিন্নতাবাদী কাশ্মীরি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংঘর্ষ। রাষ্ট্রীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য নায়কের আগুনে

ঝাঁপ মেলোড্রামার কাঠামোতে জাতীয়তাবাদের আবেগকে প্রবল করে তোলে। কিন্তু প্রথম যে দৃশ্যটিতে কাশ্মীরের উগ্রপন্থীদের আবির্ভাব ঘটে– সেই দৃশ্যটি মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রার্থনার দৃশ্য। সিনেমার ইঙ্গিত যে বিশ একটি গোষ্ঠীকে উগ্রপন্থার সঙ্গে সমীকৃত করতে চায়– তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এইভাবে সাতের দশকেরপ্রতিষ্ঠান–বিরোধী নায়কের রাজ্যপাটের অবসান ঘটিয়ে নয়ের দশক থেকে পাকিস্তান বিরোধী দেশপ্রেম ও প্রশ্নহীন,শর্তহীন তীব্র রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের প্রচারক হয়ে উঠেছে কিছু হিন্দী সিনেমা। 'বর্ডার','গদর', 'কার্গিল','বীরজারা' এরকমই কিছু সিনেমা যেগুলি নতুন ভাবে ভারতীয়ত্বের ধাঁচাটিকে তৈরী করতে থাকে। এই নতুন রকমের ভারতীয়ত্ববোধের প্রচারের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে জাতীয়তাবাদী নায়ক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। অনেক সিনেমা তৈরী হয় সেনাবাহিনীর দেশপ্রেম, যুদ্ধ ও বীরত্বের কাহিনি নিয়ে। 'রোজা' সিনেমাটি এই ধরনের সিনেমার পথপ্রদর্শক, এরপর 'বর্ডার', 'কার্গিল', 'চায়না গেট' ইত্যাদি সিনেমা বাজার দখল করে নেয়। ১৯৯৮ সালে নির্মিত 'চায়না গেট' যেন 'শোলে' সিনেমার সংশোধনী। একই ভাবে নৃশংস ডাকাতের দ্বারা নির্যাতিত একটি গ্রামকে উদ্ধারের কাহিনি এটি। উদ্ধার করছে দশজন সাজাপ্রাপ্ত সেনা অফিসার – কারণ এটাই তাদের দেশপ্রেমের প্রমাণ ও প্রায়শ্চিত্ত–ও বটে। তাদের কর্মোদ্যোগ রাষ্ট্রীয় আইন ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যই। সাজাপ্রাপ্ত অফিসার কৃষ্ণকান্ত পুরীর রাষ্ট্রের দ্বারা সম্মানপ্রাপ্তির মাধ্যমে তাই গল্প শেষ হয়। এই সিনেমায় দশজন সেনা অফিসারের একজন হিন্দু পাঞ্জাবী, একজন মুসলমান – যারা দেশভাগকে কেন্দ্র করে পরস্পরের প্রতি সন্দেহপ্রবণ। যদিও সেই ঘৃণা দূর করে ঐক্যবদ্ধ জাতি নির্মাণের বার্তা সিনেমাতে আছে, তথাপি বিশেষভাবে যে বিষয়টি লক্ষণীয়, মুসলমান অফিসার সরফরোজকে রাষ্টীয় ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে সর্বাগ্রে আত্মাহুতি দিয়ে ভারতীয়ত্ব প্রমাণ করতে হয়। উত্তর–পূর্বের অফিসার গুরুং–ও আছে এই দলে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি থাকলেও সমসত্ত্ব জাতীয় সত্তাপ্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক প্রচেষ্টাটিও সিনেমাটিতে গোপন থাকেনি। 'শোলে'–র প্রতিষ্ঠান–বিরোধী ক্রোধ এই সিনেমায় সম্পূর্ণ নির্বাপিত।

তবে দুহাজার সালের পরবর্তী সাম্প্রতিক সময়ের একটি ব্যতিক্রমী সিনেমা 'হায়দর'–এর কথা উল্লেখ না করলেই নয়– যেখানে রাষ্ট্রীয় আধিপত্যবাদকে সমালোচনা করা হয়েছে। সিনেমাটিতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দেশপ্রেমিক নায়কের ক্লিশে ভূমিকা নেই, পরিবর্তে দেখানো হয়েছে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অনুশাসন নাগরিকের অধিকার হরণ করে। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের ফোকালাইজেশন থেকে রাষ্ট্রনীতির আগ্রাসনের গল্প বলা হয়েছে এই সিনেমায়। রাষ্ট্রীয়–যন্ত্রের নিষ্পেষণে

মানুষের হারিয়ে যাওয়ার গল্প এটি। বেঁচে থাকাটাই একটা দুর্ঘটনা বলে মনে হয় কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের কাছে। ঝিলম নদীর তীরবর্তী মানুষগুলি কাছে তাই রাষ্ট্র এক ভুলভুলাইয়া হয়ে উঠেছে।

একথা না মেনে উপায় নেই নয়ের দশকের মুক্ত অর্থনীতির সময় থেকে হিন্দি সিনেমার নায়কের ধারণায় বাজার–সংস্কৃতির শর্ত মেনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। রাজ কাপুরের ভবঘুরে, দিলীপ কুমারের গ্রামীণ যুবক অথবা অমিতাভের রাগী নিম্নবিত্ত যুবকটিকে প্রতিস্থাপিত করেছে পেশীবহুল শিল্পপতি অথবা অনাবাসী নায়করা। এখন কেবল শহর, ব্যবসা আর বাজারের আধিপত্য। বিশ্বায়নের এই আধুনিকতা নেহেরু–ঘরানার আধুনিকতার থেকে আলাদা। এখন ভোগের মানচিত্রে এসেছে আন্তর্জাতিকতা। নয়ের দশক থেকে তাই জনপ্রিয় সিনেমাতে কেবল পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর সমাহার। পাঁচের দশকের নায়করা গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল, এখন শহর গ্রাস করে নিয়েছে গ্রামকে। ধরা যাক 'লগান' ছবিটি – গুজরাটের একটি গ্রামের উপনিবেশের প্রভুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনি। 'লগান'–এর গ্রাম ক্যামেরার কারসাজিতে, রং–এর সুচতুর ব্যবহারে হয়ে উঠেছে স্বর্ণাভ কল্পলোক। পাঁচের দশকের গ্রাম ছিল আদর্শায়িত গ্রাম। কিন্তু 'লগান' সিনেমায় সেই গ্রাম রূপকথার জগতের – ঝকঝকে, বিক্রয়যোগ্য পণ্য। এই গ্রামের মানুষরা খাজনা দিতে না পেরে মরে যাবে – এইটুকু কাহিনির ভূমিকামাত্র। এরপর থেকে তাদের খাদ্য আহরণের জন্য ভূমিকর্ষণ বা শ্রমদান কোন কিছুই করতে দেখা যায় না। স্বাধীনতা সংগ্রামের ধ্রুপদী মর্যাদা ত্যাগ করে এই গ্রামের সংগ্রাম একটি ক্রীড়া–কৌতুকে পরিণত হয়েছে। গ্রামের মানুষ হিন্দু–মুসলিম মিলিত ভাবে প্রতিবাদী খেলার প্রস্তুতি নিয়েছে। এদের সঙ্গে একজন শিখ বাইরে থেকে এসে যোগদান করেছে, অস্পৃশ্য যে তাকেও দলে নেওয়ার জন্য নায়ক প্রায় গান্ধীবাদী রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা পালন করেছে এবং এইভাবে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে ওই গ্রামবাসীরা। অথচ শারীরিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সবাইকে হিন্দু–ধর্মীয় সূর্যপ্রণাম নামক যোগাসনটি করতেই হয় এবং এইভাবে বৈচিত্র্যকে হরণ করে হিন্দু জাতীয়তাবাদ মিশিয়ে নেবার অজগর–আগ্রাসন প্রকট হয়ে ওঠে। সমস্ত কাহিনি জুড়ে ক্রীড়া–কৌতুকটির বিস্তার– মাঝে মাঝে তথাকথিত দরিদ্র মানুষরা নৃত্য–গীতের মাধ্যমে দর্শকের মনোরঞ্জন করেছে। সেই নৃত্যের মাঝেই গবাদি পশুচারণ– সব মিলিয়ে একটি শৈল্পিক নৃত্যনাট্যের দৃশ্য যেন। চলচ্চিত্র সমালোচক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় তাই বলেছেন–

> বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে বিদ্বেষ ও ঘৃণা, শ্রেণি ও শোষণ, প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ শব্দগুলি অন্যরকম অর্থে সাজানো জরুরী। তাই ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনাকে অনেক

পেলব, নমনীয় ও রোমান্টিক রূপ দেওয়া হল।[১৪]

'লগান' নয়ের দশকের বাজার অর্থনীতির শর্ত মেনেই ভারতীয় গ্রামকে স্বপ্নলোক বানিয়ে পণ্য করতে চেয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে। একই সঙ্গে ক্রিকেটকেও জাতীয় আবেগের মায়াবী ঐক্যসূত্র বুঝতে পেরে চাতুর্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। বলিউডি ফিল্ম ও ক্রিকেট– ভারতেরপ্রধান দুটি বিনোদন পণ্য ও রাষ্ট্র–সাম্য ও সার্বভৌমত্ব আরোপণের প্রধান দুটি মাধ্যম। লগান সিনেমা এই দুই–এর মিলনক্ষেত্র।

বস্তুতঃ বাজার সংস্কৃতি সকলপ্রকার স্থানীয় বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে সব কিছুকেই সমরূপীয় করতে চায়। মার্কস–এর কথায়– In place of old local and national seclusion and self sufficiency, we have intercourse in every direction, universal interdependence of nations.[১৫] তাই নয়ের দশকের থেকে ভারতীয়ত্ব মানেই সমরূপত্ব অথবা হিন্দুত্ব। আবার এই হিন্দু জাতীয়তাবাদ অথবা ভারতীয়ত্বকে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয়যাগ্য পণ্যতে রূপান্তরের প্রচেষ্টাও এই সময় থেকেই দেখা যায়। 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে', 'কভি খুশি কভি গম' এইরকম সিনেমার উদাহরণ। নয়ের দশকের এই সিনেমাগুলির অনেকগুলো আবার wedding celebration film। এই সিনেমাগুলি প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্তের নতুন ভোগবাদী জীবন–আকাঙ্খা ও স্বপ্নের সওদাগর। সিনেমাগুলি সম্পদ, পোশাক, বৈভব, থিম বিবাহ ইত্যাদির বিজ্ঞাপণ, আবার সনাতনী নারীত্ব, মাতৃত্ব, হিন্দু পূজা ও বিবাহরীতি, পরিবারকেন্দ্রিক মূল্যবোধ, জাতীয়সঙ্গীত প্রভৃতি উপাদানের সমাহারে হিন্দী–হিন্দু ভারতীয়ত্ব নির্মাণের মাধ্যমও বটে। ভারত যেহেতু বৃহৎ বাজার হিসেবে ক্রম–প্রকাশিত, তাই বাজারের প্রয়োজনেই একটি সুসমঞ্জস, শৃঙ্খলাপরায়ণ ক্রেতাগোষ্ঠী দরকার। বাজার বিচ্ছিন্নতা–সঞ্জাত দ্বন্দ্ব অস্থিরতা চায় না। তাই বাজারের স্বার্থেই সমসত্ত্ব জাতীয়তাবাদের নামে রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের বিস্তার ঘটানোপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। নয়ের দশক থেকে হিন্দী সিনেমা সেক্ষেত্রেপ্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছে। ক্ষমতাই হয়ে উঠেছে সংস্কৃতির গতি নির্ধারক এবং রাষ্ট্র–ই রক্ষকের ছদ্মবেশে যন্তর–মন্তর ঘরের রাক্ষস – একথা বুঝতে যখন পারা যায়, তখন ভারতীয়ত্ব, জাতীয়তাবাদ শব্দগুলি নিছক ছায়া–ছায়া ছবিতেই পরিণত হয়।

তথ্যসূত্র:

১। Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: VersoNew Left Books,1991), p. 7.

২। Benedict Anderson, তাঁর বইটির নাম *Imagined Communities*, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র–কেন্দ্রিক জাতিকে তিনি imagined অর্থাৎ কাল্পনিক বলেছেন।

৩। পার্থ চট্টোপাধ্যায়–এর অনুবাদ, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার* (কলকাতা ঃ আনন্দ, ২০০০), পৃ–২৬।

৪। Quoted from Amartya Sen, 'Is Nationalism a Boon or a Curse', *Economic and Political Weekly* 43.7 (2008): 40.

৫। Brigitte Schulze, *The Cinematic 'Discovery of India: Mehboob's Re-invention of the Nation in Mother India*, *Social Scientist* 30.9 (2002): 72-87, 74.

৬। Raymond Williams, *Keywords* (London: Fontana,1983), p. 90.

৭। Williams, *Keywords*, p. 90.

৮। Stuart Hall, '*The rediscovery of ideology: the return of the repressed in media studies', Subjectivity and Social Relations*, eds. Veronica Beechey and James Donald (Milton Keynes: Open University Press,1985), p. 36.

৯। Brigitte Schulze, *The Cinematic 'Discovery of India: Mehboob's Re-invention of the Nation in Mother India*, p.72.

১০। Sekhar Bandyopadhyay, *Decolonization of South Asia: Meanings of Freedom in Post-Independence West Bengal*,1947-52 (Hyderabad: Orient BlackSwan,2012), p. 123.

১১। Bandyopadhyay, Decolonization of South Asia, p. 124.

১২। Tonny Benett, *Popular Culture and the turn to Gramci, Cultural Theory and Popular Culture: A Reader*, 2nd edn. Eds. John Storey, Hemel Hemstead (Prentice Hall,1998), p. 221.

১৩। Meenakshi Sheshe, *Bollywood Cinema: Making Elephants Fly, Cineastes* 31.3 (2006): 24 -29, 29.

১৪। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, *সেদিন দুজনে, বিশ্বায়নে*, সন্ধান, বিশ্বায়ন সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষঃ প্রথম সংখ্যা, সম্পা–সুমিতা মুখোপাধ্যায়, দেবযানী সেনগুপ্ত, সুবর্ণা মন্ডল (কলকাতা: দিয়া পাবলিকেশন, ২০১৭), পৃ.১১ – ২৮, ১৯।

১৫। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, *সেদিন দুজনে, বিশ্বায়নে*, পৃ.১২।